# উত্তরের আকাশ

উমেশ শর্মা

গ্রন্থতীর্থ
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

# সূচিপত্র


- পারাপার ১১
- কাফেরের খোঁজে ১৬
- আনারসের রস ২১
- ব্লু-ব্যাঙ্ক চা বাগানে ২৪
- সপ্তমীতে নয়, পূর্ণিমাতে ২৭
- ফৌজি আদর ৩২
- চিতল মাছের কাঁটা ৩৫
- পিস্তল ৩৭
- অবক্ষয়ের পালা ৩৯
- এ অহংকার ৪২
- প্রধান নির্বাচন ৪৪
- হরিরামপুরের বিষ্ণুমূর্তি-অন্তর্ধান রহস্য ৪৮
- গৌরীহাটের বারুণি স্নানে ৫২
- আরশোলা ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ৫৭
- পলিসির টেবিল ৫৯
- সীমা মেনে ৬২
- ম্যায় অচ্ছা হুঁ ৭০
- কালীপূজা ডট্ কম ৭৩
- পণ্যা — ১ ৭৬
- পণ্যা — ২ ৭৯
- পণ্যা — ৩ ৮৩
- পণ্যা — ৪ ৮৫
- পণ্যা — ৫ ৮৯
- পণ্যা — ৬ ৯২
- পণ্যা — ৭ ৯৪

# পারাপার

আপনার নাম?

শাশ্বত চ্যাটার্জি

পিতা?

স্বর্গীয় শ্যামাপদ চ্যাটার্জি।

ঠিকানা?

ঘোষপাড়া, ডাকঘর-বেলাকোবা, জেলা-জলপাইগুড়ি।

বাংলাদেশে কোথায় যাবেন?

পাবনা

যেখানে যাবেন, তার নাম-ঠিকানা বলুন।

লিখুন, শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দে। সাং-জাতসাখিনী, থানা-বেড়া। পাবনা।

সঙ্গে কত টাকা আছে?

শ'পাঁচেকের মতো।

সঠিকভাবে বলুন। পাঁচশো, আর পাঁচশো'-এর মতো এক কথা নয়।

এবার উত্তর দিল শাশ্বত — পাঁচশো বাংলাদেশি টাকা।

— দিন দু'শো টাকা। পাশপোর্টটি উল্টিয়ে রাখলেন চ্যাংরাবান্ধার ইন্ডিয়ান কাস্টমস অফিসের কেরানি বাবুটি। সঙ্গে অত টাকা নিয়ে যাওয়া যায় না।

শাশ্বত স্পষ্ট দেখল, যিনি এতক্ষণ ধরে এ প্রশ্নগুলি করছিলেন এবং একটি খাতায় লিখছিলেন, তিনি শাশ্বতের পিতার নামের বানান লিখলেন সরগীয় সেমাপদ চেটারজি এবং তার নিজের নাম লিখলেন শাতসত চেটারজি। অথচ টাকা চাওয়ার সময় উচ্চারণে কোনো ভুল হল না।

সে উত্তর দিল— দেখুন, আমি একজন শিক্ষক। পাশপোর্ট ও ভিসায় কোনো ভেজাল নেই। এন্ড ইট ইজ এনডোরস্‌ড বাইদি অনারেবল হাই কমিশন অব্ বাংলাদেশ। আমি কোনো অসাধু উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে যাচ্ছি না। তবে ঘুষ দেব কেন? আর তা ছাড়া, আমাকে তো বলা হয় নি, আমি কত টাকা নিয়ে যেতে পারব?

—জ্ঞান দিবেন না। জ্ঞান দিবেন না। ডলার নিলেন না কেন? বেশ স্পষ্ট করেই বলছি — কুড়ি টাকার ইন্ডিয়ান কারেন্সি ছাড়া আপনি কিছু নিয়ে যেতে পারবেন না — কেরানি বাবুর সাফ জবাব।

— আর বাসভাড়া? সেখানে যাব কী করে?

— কেন, এখানে দু'শো টাকা দিলেও তো আপনার তিনশো টাকা থাকবে। আপনার স্পনসর তো আপনার সব খরচ দিচ্ছেই।

বাধ্য হয়ে একশো টাকার একটি নোট এগিয়ে দিল শাশ্বত। কেরানিবাবুটি সেটির দিকে

আড়চোখে তাকিয়ে বললেন, দেখি আপনার ব্যাগ। খুলুন। খুলুন। একদম দেরি করবেন না।

শাশ্বত ব্যাগ খুলে তার জামা-কাপড়, লুঙ্গি গামছা, টুথপেস্ট-সেভিং সেট মেলে ধরল। এর সঙ্গে একটা ফোলিও হ্যান্ড ব্যাগ, ডায়েরি, কিছু বইপত্র, দু'প্যাকেট বিস্কুট ইত্যাদি এক এক করে ব্যাগ থেকে বের করল।

এবার দুর্গাপূজা আশ্বিনে হয়েছে। আজ পঁচিশে অক্টোবর। লক্ষ্মীপূজার পর পরই সে বাংলাদেশে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে চলেছে। চড়া রোদ। কাস্টমস অফিসে আসবার পূর্বে সে মাইল খানেক দূরে পাশপোর্ট অফিস ঘুরে তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে শ্রান্ত -ক্লান্ত হয়ে এসেছে। এখানে লোকজনও কম নেই। বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ, শিশু ভিড় করে আছে বারান্দায়। অনেকক্ষণ পরে তার ডাক পড়েছে। ব্যাগে অবৈধ জিনিসপত্র কিছু নেই। করণিক শাশ্বতের ইস্তিরি করা জামাকাপড় ঝেড়ে-ঝুড়ে তছনছ করলেন। টুথপেস্টের খাপ পরীক্ষা করলেন, ফোলিও ব্যাগের চেন খুলে কাগজপত্র দেখলেন এবং বইগুলি নিয়ে তা আলাদা করে রাখলেন। জিজ্ঞেস করলেন — এগুলি কিসের বই ? পাশপোর্ট অফিসে এন্ট্রি করে এনেছেন ?

শাশ্বত মাথা নাড়ল।

কেরানিবাবু বললেন — আরও একশোটাকা ছাড়ুন। না হলে এগুলো নিয়ে যেতে পারবেন না, তাড়াতাড়ি করুন। আমার কাজ আছে।

শাশ্বতের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। এখন একটা বাজে। কুড়িটাকা রিকশাভাড়া করে সে পাশর্পোট অফিস থেকে এখানে এসেছে।

রিকশায় এক কি.মি. পথ। রিকশাওয়ালা শাশ্বতকে নতুন লোক মনে করে ঠকিয়েছে। আসার পথে কালীপূজার চাঁদার উৎপাতে তার পকেট থেকে আশি টাকা খসেছে। দশ-বিশ পঞ্চাশ হাত দূরে দূরে চাঁদা তোলার পার্টি। মা-কালীর ভক্তেরা দাঁড়িয়ে।

আবার ফিরে যেতে হবে সেখানে! সেখানে গিয়ে বইপত্র এন্ট্রি করিয়ে আনতে হবে! শাশ্বতের কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল। বলল— আরও একশো দিলে আমি পাবনা যাব কী করে ? আপনি দয়া করে আর চাইবেন না।

ধমকে উঠলেন দুঁদে করণিকমশাই। ডলার করেন নি কেন ? একটার পর একটা ভুল করবেন আর এখানে এসে দেউলিয়া। যান যান মশাই, এন্ট্রি করে আনুন।

মনে পড়ে পাশপোর্ট অফিসের কথা। সেখানে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঘিরে ধরে টাকা এক্সচেঞ্জ-এর জন্যে, পাশপোর্ট এন্ট্রি করানোর জন্যে কিছু দালাল। সেখানে চারশো টাকা ভাঙিয়ে সে পেয়েছে বাংলাদেশের পাঁচ'শ টাকা।

শাশ্বতকে ঠকানো শুরু হয়েছিল প্রথম থেকেই। চ্যাংরাবান্ধা বাস স্টপেজে নেমে সে একটা রিকশা ধরেছিল। বলেছিল — ইমিগ্রেশন অফিস চেনো ভাই! বল, কত নেবে?

রিকশাওয়ালা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলেছিল — পঁচিশ টাকা।

— কেন ? কতটুকুই বা পথ ? এত লাগবে কেন ? ভাড়া তো পাঁচ টাকা! পথের দূরত্ব জানার ভান করে আন্দাজে সে একথা বলে।

রিকশাওয়ালা বলে — দূরত্ব তো অনেকটাই। কাঁচা রাস্তা। তাছাড়া পাশপোর্ট অফিস, টাকা ভাঙানো এবং সেখান থেকে কাস্টমস অফিস এবং সেখান থেকে বি. এস. এফ

ক্যাম্প — ও অনেক ঝামেলা বাবু। ঘণ্টা দুয়েক সময় লাগবে। কোনোটাই কাছে নয়। অনেকটা দূর।

শাশ্বত দরদাম করে কুড়ি টাকা ফাইন্যাল করে রিকশায় চেপে বসে। একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পায়ের উপর আরেক পা চাপিয়ে মনের আনন্দে রিকশাওয়ালাকে বলে — চল। তখন কি আর সে জানতো যে প্রায় এক কি. মি.-র মধ্যে তাকে ঘুরপাক খেয়ে কুড়ি টাকা দণ্ড দিতে হবে।

কাষ্টমস অফিস থেকে স্টার্টিং পয়েন্ট যাবার ভয়ে অর্থাৎ কালীপূজার চাঁদার ভয়ে তাই সে কেরানিবাবুকে আরো পঞ্চাশ টাকা দেওয়া বেশি লাভজনক মনে করে। এই ভেবে সে পঞ্চাশ টাকার একখানা নোট এগিয়ে ধরে কেরানিটির কাছে।

কাষ্টমস-এর চেকিং শেষ করে পুনরায় রিকশায় চাপে শাশ্বত। এবার বি. এস. এফ ক্যাম্প। এ ক্যাম্পের পরেই নো ম্যানস ল্যান্ড। তারপরেই বাংলাদেশের বুড়িমারী চেক পোস্ট।

বি. এস. এফ-এর একজন জোয়ান শাশ্বতের পাশপোর্ট জমা নিল। মিনিট দশেক পরে ডাক পড়ল — শাশ্বত চ্যাটার্জি।

শাশ্বত সামনে গেল।

—আপনা ব্যাগ খুলিয়ে ? কোই ক্যামেরা, টেপ, ফ্রুটস হ্যায় ক্যায়া ?

— নেহি সাব, শাশ্বত বলে।

দু-মিনিটের মধ্যে সেখান থেকে ছাড়া পেল সে। এবার আর রিকশা যাবে না। হাঁটতে হবে এক ফার্লং-এর মতো। ধুলো রাস্তা। চড়া রোদ। বাঁয়ে ধরলা নদী, ডাইনে বি. ডি. আর, ক্যাম্প। ধুলোমাখা গায়ে দাঁড়িয়ে সারি সারি ট্রাক, যাবে বাংলাদেশ। পাথর ভর্তি। বাংলাদেশের বড়াখাতার পশ্চিমে তিস্তা নদীর ব্যারেজের কাজে লাগবে। কাগজপত্র পরীক্ষার জন্য ড্রাইভারের খালাসি এগিয়ে গেছে বি. ডি. আর. চেক পোস্টে। গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার দাঁড়িয়ে। ডি. টি. টি জাতীয় ওষুধ স্প্রে করা হচ্ছে যাতে ইন্ডিয়ার প্লেগ রোগ বাংলায় না যায়। অবশ্য জলপাইগুড়ি-কোচবিহারের যাবতীয় জঞ্জাল, ময়লা নিয়ে বয়ে চলেছে ধরলা নদী। তাকে কে আটকায়! লোকজন, ট্রাক, রিকশা-সকলের সঙ্গে সেও চলেছে বাংলাদেশে, নেচে নেচে।

বি. ডি. আর. চেকপোস্ট রাস্তার উপরেই। কাছে যেতেই যতেক ভ্যানওয়ালা ছুটে এল। স্যার, কোথায় যাইবেন — ঢাকায় ? বাস রেডি — এন. ভি, না বি. টি, কোনটায় যাবেন ? সিট চাই, দ্যান পাশপোর্ট।

পাশপোর্ট জমা নিল বি. ডি. আর-এর এক তরুণ যুবক। বুকের মধ্যে বাংলায় লেখা নাম — মোঃ জহিরুদ্দিন।

ইন্ডিয়া যাইবেন না ইন্ডিয়ার থাইক্যা আইলেন ? সবিনয়ে জানতে চায় যুবক।

ইন্ডিয়া থেকে এসেছেন শুনে তিনি টেবিলের পাশে রেখে দিলেন পাশপোর্ট। আরও তিনটে পাশপোর্ট জমা ছিল সেখানে। বা-দিকে ইন্ডিয়া যাবার পাশপোর্ট।

জি, সঙ্গে খাবার কী কী আনছেন ? ব্যাগডারে খোলেন দেখি।

—না, বিশেষ কিছু নেই। দু-প্যাকেট ব্রিটানিয়া বিস্কুট আর একটা হরলিক্স-এর শিশি। একেবারে নতুন। খুলিনি। ইন্ডিয়া চেকপোস্ট-এ এটার কথা বলতে ভুলে গিয়েছিল শাশ্বত।

—বাহির করেন। টেবিলে রাখেন।

শাশ্বত সেগুলি টেবিলে রাখল। ভাবল টুকে নিয়ে এখনই ফেরত দেবে। কিন্তু নাঃ। প্লেগের জার্ম আছে সেই সিলড কভারর্ড প্যাকেটগুলোতে — এই আশংকায় সেগুলি জমা হল টেবিলের অন্য পাশে। বলল— বিকেল পাঁচটায় এগুলো পোড়ানো হবে। সে দৃশ্য দেখবার জন্য শাশ্বতকে আমন্ত্রণ জানাল যুবকটি। ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত শাশ্বত বলল— দেখুন এখনও আমি টিফিন করিনি। ওগুলো দিন। অন্ততঃ পক্ষে বিস্কুটের প্যাকেটটা। খেয়ে ফেলি।

নাঃ—একটাই উত্তর।

বাধ্য হয়ে এসবের আশা পরিত্যাগ করে সে এবার পা বাড়াল অ্যান্টি প্লেগ মেডিক্যাল সেন্টারে। সেখানে আছেন ডাক্তার নার্স।

যদিও শাশ্বত জলপাইগুড়ি ডি. এম. ও. মহোদয়ের কাছে প্লেগ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট দিয়ে গিয়েছিল, তবুও বাংলাদেশের ডাক্তার বাবু তার গলা ও বগলে হাত দিয়ে নিশ্চিত হলেন। প্লেগ নেই। পাশপোর্টের উপর তা লিখে দিলেন।

এবার ভ্যানওয়ালা পাশপোর্ট বইটা সেখান থেকে নিয়ে দিয়ে এল বাংলাদেশ কাস্টমস অফিসে। পাশেই বিল্ডিং। বারান্দায় অফিসার বসে আছেন। ঘরের মধ্যে তিনটে বিছানা। এক বিছানার সঙ্গে টেবিলে বসে কাজ করছেন দু-জন কর্মচারী।

আবার নাম-ঠিকানা জিজ্ঞাসার পালা। উনিও শাশ্বতের নামের বানান লিখলেন সাতসত চেঃ। দু-বার জিজ্ঞাসা করেও নামটি লিখতে পারলেন না। সেটা স্বীকার করে নিয়েই বললেন — আপনার মা আপনারে এই নামে কেমন করে ডাকে? আর নাম পাইলেন না।

আবার ব্যাগ খোলা হল। পরীক্ষা করলেন নামমাত্র। ভ্যানওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলেন — কত দিছে?

ভ্যানওয়ালা শাশ্বতকে বাইরে ডেকে এনে বলল — দ্যান, একশো কুড়ি টাকা।

—কেন? জানতে চায় সে।

—এখানে একশো কুড়ি নেয় পাশপোর্ট প্রতি।

—ক্যাশমেমো দেবে?

— দিবেন তো দিন। না হলে ওই যে উল্টিয়ে রাখলেন পাশপোর্টটি, সেটা আর সোজা হবে না পাঁচটার আগে। বাস ফেল করলে রাত্রে থাকবেন কোথায়?

শাশ্বত এ অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে কার কাছ নালিশ করবে জানে না। বাইরের অফিসার শুধু সই করেন। তিনিও কিছুক্ষণ আগে এসে এখানে বলে গেলেন — আইজ এক হাজার টাকা লাগবো জমির মিঞা। দুল্‌হা ভাই এসেছেন বাড়িতে।

বাধ্য হয়ে একশো টাকার আর একটা নোট এগিয়ে ধরল শাশ্বত, আর হতে থাকল আর মাত্র দেড়শো টাকা। ভ্যানওয়ালাকে বলল, ভাই তোমাকে কত দিতে হবে? আর পাবনা যাবার বাসভাড়াই বা কত?

ভ্যানওয়ালা বলল, আমাকে যা দেবার দিইয়েন স্যার। এজন্য একজন ভাইবেন না। বাসের টাইম হইয়া গ্যাছে। সিট রাখার জন্য লোকও পাঠানো হইয়া গ্যাছে গিয়া। চলেন তাড়াতাড়ি যাই। ভাড়া একশো ত্রিশ আর আমাকে কুড়ি টাকা দিলেই হইবো।

শাশ্বত হাফ ছেড়ে রিকশার দিকে ব্যাগ নিয়ে ছুটল। বারান্দা থেকে ভ্যানওয়ালা চিৎকার করে উঠল — স্যার যাইতেছেন কোথায়? পাশপোর্ট অফিসে এন্ট্রি করাইবেন না?

আরও আছে? বিধ্বস্ত শাশ্বত যেন ক্রমশ পশ্চিম গগনে হেলে পড়ল।

ইমিগ্রেশন অফিস ঘরটা বড়ো। দুটো বিশাল টেবিল। পাশে একটা বিছানায় তিনজন বসে গুলতানী করছিল "সানন্দা"র একটা সংখ্যা নিয়ে।

ঘরের দরজার বাইরে শাশ্বতকে ব্যাগটা রেখে ভেতরে যেতে হল। অরক্ষিত ব্যাগের গার্জিয়ান ভ্যানওয়ালা, আর তার জানমানের মালিক সামনের টেবিলে বসা মিঞাভাই।

পাশপোর্ট উল্টিয়ে যথারীতি নামধাম জিজ্ঞেস করেই আবার সেই একই পদ্ধতিতে সেটিকে উল্টিয়ে রেখে বললেন — পঞ্চাশ টাকা দিন।

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে শাশ্বতর চোখ ফেটে জল এল। সে কেরানিবাবুটিকে স্যার সম্বোধন করে বলল — স্যার, আমাকে সার্চ করুন। আমার সঙ্গে দেড়শো টাকা আছে। অতিরিক্ত পাঁচ টাকাও নেই। যাব পাবনা। বাসভাড়া শুনলাম একশ ত্রিশ। ভ্যানওয়ালা চাইল বিশ। টিফিন করিনি। রাত্রে থাকব কোথায়, খাব কী? যে আত্মীয়বাড়ি যাচ্ছি, ভদ্রতার খাতিরে সেখানে একটু-আধটু মিষ্টি নিয়ে যেতে হবে। আর তাছাড়া আজ পঁচিশে অক্টোবর, ফিরব দশই নভেম্বর। এ কদিনে খাওয়া-দাওয়া না হয় জুটল সেখানে, কিন্তু পকেট খরচা? স্যার আমি বাংলাদেশে আর যাব না। আমাকে ছেড়ে দিন স্যার। আমি বাড়ি ফিরে যাই স্যার।

নজরুল ইসলাম কেরানি সাহেব, শাশ্বতের পা থেকে মাথা পর্যন্ত জরিপ করলেন। তারপর বললেন—ঠিক আছে। আজ যান। সার্চটা ফেরার দিনই করা যাবে।

শাশ্বত রুদ্ধনিশ্বাসে পাশপোর্ট নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে ভ্যানওয়ালাকে বলল, ভাই তুমি যাও। এই নাও পাঁচ টাকা, আমি হেঁটেই যাব।

ভ্যানওয়ালা বলল — স্যার, আমার নাম বাদল। আপনে উইঠা পড়েন আমার ভ্যানে। বাসের সময় পার হইয়া গেছে। তবে বাসটা আছে। আপনাকে আর টাকা দিতে হইবো না আমারে।

এবার রিকশায় উঠে বসল সাতসত চেঃ।